মার্চ ২০১৫

জার্মান প্রবাস

এক টুকরো বাংলাদেশ

উত্তরণে নারী

সূচিপত্র

১ আমাদের কথা

২১ নোটিসবোর্ড

২ শুধু ছুটে ছুটে চলা: যোবাইদা আক্তার লিলি

৬ স্বপ্ন পূরণের কথা: ফাতেমা-তুজ-জোহরা নাহিদ

৮ আমার আস্ফালন: মাহজাবীন চৌধুরী

১৬ কবিতা- স্বাধীনতার স্বপ্ন: আজমেরী হাসনাত মুন্নী

১৩ স্বাধীনতা ভার্সাস নারী: আফরোজা আইরিন

১৬ নড়বড়ে শিক্ষা ব্যবস্থাঃ সারা তাবাসসুম

১৮ রোলিংস্টোন: তানজিয়া ইসলাম

আপনার একটা চাওয়া, একটা মন্তব্য অথবা আপনার কোন অভিজ্ঞতা ভাগ করুন না আমাদের সাথে! চটজলদি লেখা পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়ঃ german.probashe@gmail.com । পাঠকের আনন্দে পূর্ণ হোক আমাদের সার্থকতা।

আমাদের কথা

সভ্যতার গোড়া হতে আজ পর্যন্ত পৃথিবী পরিশীলতা লাভ করেছে যাদের কারণে নারীর ভূমিকা তাতে আধাআধি। পুরুষের হাতে হাত রেখেই নারীরা ইতিহাসের পাতা স্বর্ণালী করে তুলতে রেখেছে অবিস্মরণীয় ভূমিকা। একজন ক্লিউওপেট্রা যেমন রুপ রস আর মোহময়ী ক্ষমতাধারী অপরদিকে মহারানী ভিক্টোরিয়া এক শক্তিমান শাসক। আছে মাদার তেরেসার মত অবতার। মেরি কুরির পদার্থ ও রসায়নে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা কে না জানে। আমাদের বেগম রোকেয়া সুফিয়া কামালের ধারাবাহিকতায় আজকে সেনা , নৌ, পুলিশবাহিনীতে নারীর জয়জয়কার। আকাশপথেও নারীর উদ্দীপ্ত পদচারণা। গত প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে নারী। সুতরাং নারীরা আর সেই অবলা নেই। বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তিসহ উন্নয়নের সকল স্তরে নারী র এখন সম্মানজনক অবস্থান।

আজকে যারা আমাদের ম্যাগাজিনে লিখেছেন তাঁরা এই গৌরবান্বিত নারীজাতির উত্তরাধিকার। তাঁরা সকলেই পৃথিবীর নানা প্রান্তের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে জটিল সব বিষয়ে পড়ালেখা করে নজরকাড়া ভূমিকা রেখে চলেছেন। পুরুষের পাশাপাশি সমানতালে চলে এরাই বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি প্রগতিশীল আধুনিক বাংলাদেশ হিসেবে পরি চিত করে তুলবে। আমরা প্রত্যাশা করি, ম্যাগাজিনের এই সংখ্যার প্রতিটি লেখা আপনাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। সবারই ভাবাবেগে আঘাত করে জানিয়ে দেবে নারীরাও পারে। এবারের সংখ্যা উৎসর্গীকৃত হল সেই কীর্তিমতীদের প্রতি যাঁরা কল্যাণকর সকল কিছু সৃষ্টিতে 'অর্ধেক' ভূমিকা রেখে চলেছেন সেই আদিকাল হতে।

টিম জার্মান প্রবাসে

১৩ মার্চ ২০১৫

২৯ ফাল্গুন ১৪২১

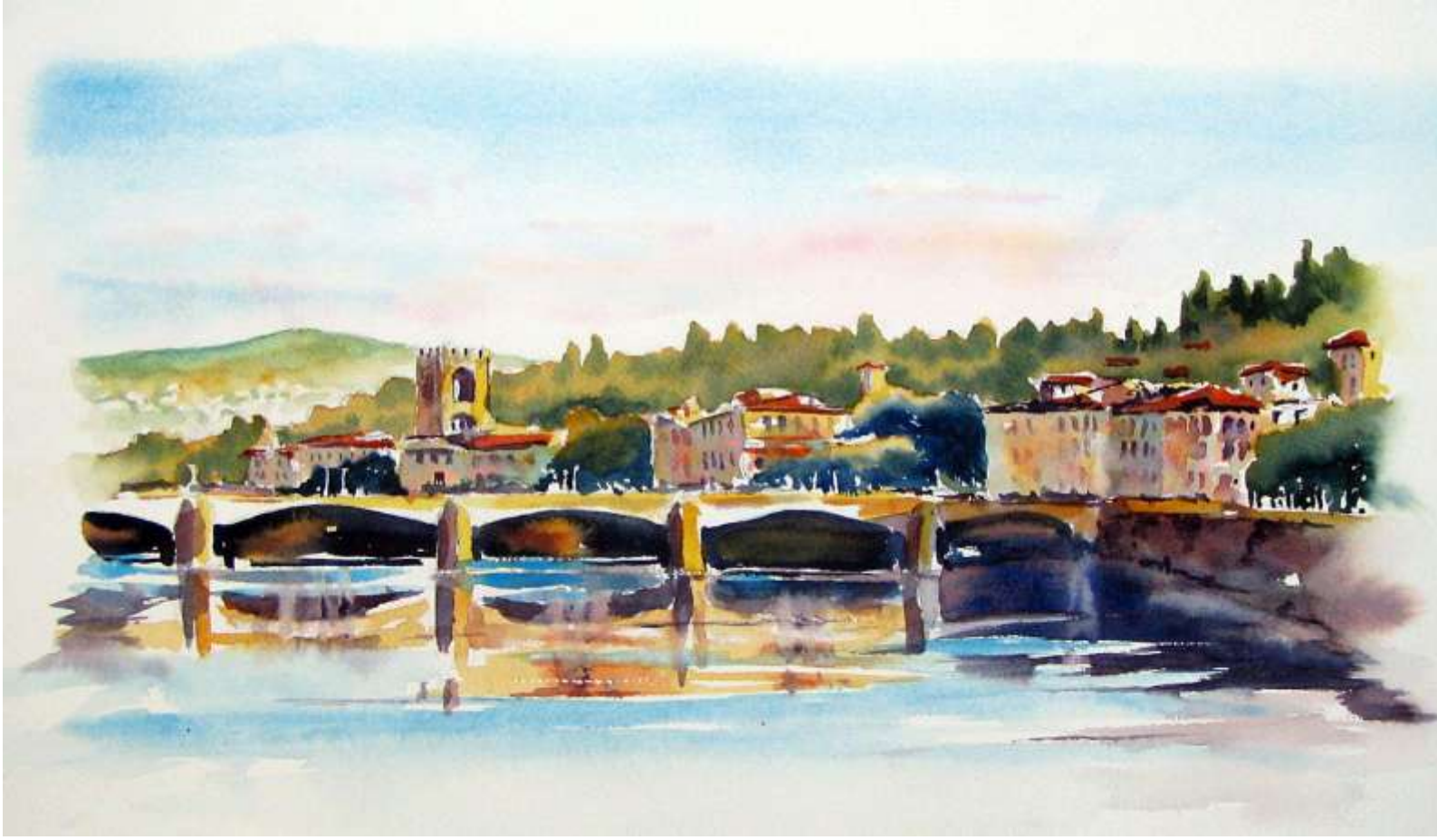

শুধু ছুটে ছুটে চলা

যোবাইদা আক্তার লিলি

আমরা সবাই তর্ক-বিতর্কে মেতে উঠেছিলাম। কেউ বলছিল জীবন পাখির মতো, উড়ে উড়ে চলা শুধু। কেউ বলেছিল জীবন হলো দীর্ঘ এক শান্ত নদী, শুধু বয়ে চলা। কখনো কখনো সেই নদীতে ঝড় ওঠে। আবার কারো মতে জীবন হলো ক্যামেরার ফ্ল্যাশব্যাক, পিছে ফিরে তাকানো বার বার...

কেউ বলেছিল জীবন হলো একটা যাত্রা। শুরু আছে, ঘটনাবহুল পথ... এরপর আছে গন্তব্য।

এভাবে ক্লাস আর ল্যাবের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের খন্ড খন্ড কথামালা একদিন থেমে গেল। অনেকটা হঠাৎ করেই আধাআধি ব্যাগ গুছিয়ে ফসফরাস প্রণালীর উপর দিয়ে উড়ে এলাম পৃথিবীর এই প্রান্তে, ইউরোপের দক্ষিণে।

প্লেন থেকে নেমে ট্রেন, ট্রেন থেকে নেমে বাস, লাম রোস্সা মানে লাল বাসে চড়ে চলে এলাম আরনো নদীর শহরে।

পরদিনই ক্লাস, নতুন শহর, ম্যাপ দেখে মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে ইউনিতে যখন পৌঁছলাম, ক্লাসে প্রফেসর তখন ঢুকে গেছে। তাড়াহুড়ো করে ঢুকলাম , বৃদ্ধ প্রফেসর চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি তিন মিনিট লেইট ? কেন?

আমি ততক্ষণে ঘামছি। আমি, ইহজীবনে বকা খাইনি টিচারদের কাছ থেকে, তারপর আবার দেরি করে ক্লাসে যাবার মতো একটা ব্যাপারে, তারপর আবার পুরো ক্লাসের সবার সামনে , এর উপর আবার বিদেশ-বিভুঁইয়ে মাস্টার্স লেভেলে যেখানে ক্লাসে ইচ্ছেমত যাবার না যাবার স্বাধীনতা থাকে বলে শুনেছি, তারপর আবার একেবারে টার্ম এর প্রথম ক্লাসে যেখানে মানুষদের নতুন জায়গা চিনতে একটু সময় তো লাগতে ই পারে... রাগে, দুঃখে, অপমানে আমার কান দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে শুধু।

ইউনি চিনতে সময় লেগেছে এই জাতীয় কিছু একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। প্রফেসর বললেন, বাই দ্য ওয়ে, আমি জাঙ্কার্লো প্রাতি। আমি তোমাদের পড়াবো...
ডট...ডট...ডট...

২।

বাসায় ফিরে সব কাগজপত্র ঘেঁটে আবিষ্কার করলাম এতোদিন 'জিয়ানকার্লো' বলে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টরকে চিনে এসেছি সে-ই হলো এই জাঙ্কার্লো! এবং শীঘ্রি জানা গেল সে সুযোগ পেলে কাউকেই বকা না দিয়ে ছেড়ে দেয় না। তবুও আমার সেই বকা খাওয়ার দুঃখ ঘুচে না ...

পাশাপাশি এটাও শিখে গেলাম, সব ইংরেজিতে লেখা হলেও একটু টেনেটুনে সুর করে বললে আর শব্দের শেষ অংশটা নির্দিষ্ট কিছু প্যাটার্ন অনু যায়ী বদলে দিলেই সেটা ইতালিয়ান হয়ে যায়। প্রোগ্রাম সেক্রেটারী পই পই করে বললো, তোমাদের জন্যই মূলত ডিজাইন করা হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা, শেখো একটু , কাজে আসবে পরে। তাকে বললাম, আমাদের প্রেশার আর লোড জানো তো!

আমরা সবাই একমত- খেয়ে দেয়ে আমাদের আরো অসংখ্য কাজ আছে, ক্লাস করতে করতে ঘুমানোর সময় পাই না , সুতরাং আমাদের এই কাজে সময় নষ্ট করা সম্ভব না !

আর আমরা যেহেতু ভাষা সংক্রান্ত আমাদের নিজস্ব স্টাইল বের করে ফেলেছি, সুতরাং মোটামুটি কাজ চালাতে কোন সমস্যা নেই- ননচে প্রবলেমা!

কিন্তু একটু ধাক্কা খেতেই হল অনভ্যাসের দরুণ। ব্যাংকে গিয়েছি।

--পারলে ইতালিয়ানো? ইতালিয়ান বলো তোমরা?

--ন্! নোওওও...। খুব গম্ভীর গলায় জানালাম।

তারাও খুবই দুঃখী গলায় জানালো , তারা ইংরেজী পারে না ভালো।

মহা মুশকিল! কি রে বাবা ব্যাংকে আছো তোমরা কি বলো ইংরেজী পারো না!

যাই হোক! কাজটা হোক, আমরা বিদায় হয়ে ধন্য হই।

--ঠিকানা বলো, ভিয়া?

--ভিয়া ফ্রান্সেসকো পার্ডি। নাম্বার এইট, নুমেরো অত্তো।

কিন্তু কিছুতেই তারা ফ্রান্সেসকো পার্ডি চেনে না। অবশেষে মনে পড়লো, একটু সুর করে টেনে বলতে হবে , 'সি' টা 'চ' হবে ইত্যাদি...

-- ভিয়া ফ্রানচেএসকো পা...আরদি!

--ও, ইয়েস! ইয়েস! পেয়েছি এবার।

হাঁফ ছেড়ে বের হয়ে আরনো নদীর তীর ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে দেখি একঝাঁক গাংচিল নদীর পাড়ে মেলা বসিয়েছে। ছোট ছোট ঢেউয়ে আরনো বয়ে যায়, ক্লাস করে ক্লান্ত আমি হাঁটতে হাঁটতে জীবনটা বোঝার চেষ্টা করি।

সামিরা বলেছিলো, জীবনটা একটা শান্ত দীর্ঘ নদী।

৩।

কোন প্রফেসর প্রশ্নের উত্তর দিতে বিরক্ত হয় না। প্রফেসর আন্দ্রেওল্লি তো নয়-ই। ব্রুস, দারিও আর নিহান প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায় আর নিক উত্তর দিয়ে যায় ক্লান্তিহীন। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ক্লিন রুম আর ফ্যাব্রিকেশন ল্যাবের কন্সট্রাকশন কাজ দেখি...কী সুন্দর করে রঙ করে ওরা। কাজটা অনেক মজার মনে হয়...আবার পড়ায় ফিরে আসি, অ্যাসাইনমেন্ট আর লাইটপাথ সেটআপ বোঝার চেষ্টা করি...আবার হারিয়ে যাই...। আচ্ছা, যদি আমাদের এখানে রিকশা থাকতো! তাহলে আর ছুটে ছুটে লাম ভারদে ধরা লাগতো না, বেশি রাত হয়ে গেলে টেনশন থাকতো না বাস মিস করার। আর রিকশা ভ্রমণ করা যেত ছুটির দিনগুলোতে......কী সহজ প্রিয় একটা জিনিস ছিল আমার...সুযোগ পেলেই রিকশায় ঘুরে বেড়ানো...এই মামা, যাবেন? যাবেন, প্রাতালের মোড়? ঐ যে, সিএনাররের কাছে, প্রাতালে উনো, যাবেন?

৪।

এইইইইইইইইইই, লাম ভারদেএ...!

প্রতিদিন দূর থেকে বাস দেখে দৌড়ে বাস ধরার চেষ্টা , প্রায়শই বাস লাম ভারদে মিস, তাই আমরা সবাই দল বেঁধে সাইকেল কিনে ফেললাম সিকলি পার্‌রা আর মার্কোটপলি ঘুরে। প্রফেসর ডি প্যাসকোয়ালে থেকে শুরু করে জাম্পিয়েরি পর্যন্ত বেশিরভাগ যেখানে সাইকেল চালায়, তাহলে আমরা কেন নয়!

সাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা আমার নতুন , সাইকেলটাও ছোট, প্রফেসর কনটেস্টাবিল্লে দেখলেই ব্যাম্বিনি মানে শিশু সাইকেল বলে হাসতেন, তবুও বিকেলের শেষ রোদে ইউনি থেকে বেরিয়ে সাঁই করে ছুট লাগাতে যে কি দারুণ লাগতো ! বাসার কাছাকাছি এসে সোজা রাস্তা দিয়ে না এসে সাইকেলটা হাতে ধরে ডেইজী ফুলে ছেয়ে যাওয়া মাঠটা দিয়ে পার হতাম...কতশত ভাবনায় ভরে থাকতো মনটা!

তারপর ছুটির দিনে অথবা সময় যখন পাই তখন সাইকেল নিয়ে ছুট ছোট্ট শহরটার এক একটা প্রান্তে । গতির মাঝে কেমন যেন একটা আনন্দ আছে মনে হতো... অনেকের কথা মনে হতো যারা বলতো জীবনটা ছুটে ছুটে চলা শুধু ...

৫।

রিবিক বলে, প্রস্তুতি নিয়ে কখনোই কিছু করা হয়ে ওঠে না ওর। মিগুয়েলও হাত মেলায় ওর সাথে আর তাই ক্লাসে সবাই মিলে ওদের সেইরকম ঝাড়ি। আসলেই তো, মুখে বলি আর নাই বলি, আমরা ঠিকই নিজেদের প্রায়োরিটি অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে চলি কিছু না কিছুর জন্য। পরীক্ষার টেনশন, নেক্সট সেমেস্টারের জন্য ভিসা এ্যপ্লাই, শেষ মাসটায় হিসেব করে বাজার করা যাতে বাড়তি কিছু থেকে না যায়, দেশে যাবার টিকেট কাটা...সব কিছু করতে করতে মনে হচ্ছিল আমরা যেই জিনিসটা সত্যি গুরুত্ব দেই, সেটার জন্য ঠিকই প্রস্তুতি নেই।

ঈদের দিন পরীক্ষা দিয়ে তীব্র থেকে তীব্র মন খারাপে আক্রান্ত হওয়া, সারাদিন না খেয়ে, ব্যাগ গুছিয়ে, প্রফেসরের সাথে দেখা করে পরদিন দেশে উড়াল দেয়া, দীর্ঘ ট্রানজিটে বসে থাকতে থাকতে মেইল চেক করে রেজাল্ট দেখে বাধঁভাঙ্গা খুশিতে ভরে যাওয়া, দেশে একমাস বিশদিন চোখের পলকে কেটে যাওয়া, এরপর আমি নিজেকে দেখতে পাই বার্মিংহাম এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনে। ফ্রি ত্রিশ মিনিটের ওয়াইফাই, আমি একহাতে পাসপোর্ট আর অন্যান্য কাগজপত্র ধরে রেখে দ্রুত আম্মুকে ফোন দেই, হ্যালো...হ্যালো আম্মু...শুনতে পাও...হ্যাঁ...আমি...হ্যাঁ ল্যান্ড করেছি...না, কোন সমস্যা হয়নি...হ্যালো...

জীবনটাকে মনে হয় ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাক...

৬।

সেদিন লেকপাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁসগুলোকে দেখছিলাম। সময় কত দ্রুত চলে যায়! এইতো সেদিন যেন এখানে এলাম, এখন আবার যাবার পালা! এইতো সেদিন যেন প্রফেসর কিথ সেমরাউকে বলেছিল, আমরা একটু আলাদা, আমরা ব্রিটিশ ইউরোপিয়ান, আর তোমরা ইউরোপীয়ান-ইউরোপীয়ান! আমরা সবাই তুমুল হেসে উঠেছিলাম। তারপর আবার ক্লাস-পরীক্ষা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে সময় পেলেই লেকপাড়ে এসে হাঁসগুলোকে দেখে সময় কাটানো। প্রজেক্ট করতে করতে ব্যস্ত, তারপর আর ক'টা দিন পর আবার নতুন শহর...

জীবনটাকে মনে হয় একটা যাত্রা। হাঁসেরা ঘাস খায় আমার আগে জানা ছিলো না! মিগুয়েল চলে গেছে আগেই, রিবিক হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে। ফিলিপের সাথে কাজ করতে কেমন হবে, ইসবেলের সাথে ছুটির দিনে সমুদ্রতীরে বেড়ানো যাবে নিশ্চয়ই , তার আগে টিকিটটা ঠিক মতো কাটা হয়েছে কিনা, ব্যাগ গুছানো ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, সিড, মাহা আর তাথিরকে বিদায় জানানো হলো কিনা এইসব ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছিল গন্তব্যের জন্য সত্যি প্রস্তুতি নিচ্ছি তো ঠিকমতো!

লিখেছেন,

যোবাইদা আক্তার লিলি

ইরাসমুস মুন্ডুস মাস্টার্স অন ফোটোনিক নেটওয়ার্কিং ইঞ্জিনিয়ারিং,

এসটন ইউনিভার্সিটি, বার্মিংহাম,

যুক্তরাজ্য।

লেকচারার,

ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং,

চুয়েট।

স্বপ্ন পূরণের কথা

ফাতেমা-তুজ-জোহরা নাহিদ

জীবনে কখনো কোথাও কিছু লিখিনি। নিজের উপলব্ধি কারো সাথে বিনিময় করিনি। 'জার্মান প্রবাসে' কর্তৃক নারী দিবসের আয়োজনে লেখার সুযোগ পেয়ে এই প্রথম লিখতে বসলাম। তাই খুব গুছিয়ে লিখতে পারবোনা হয়ত। আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি শেয়ার করতে চাই আজ। যাতে আমার মত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা যারা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে আসতে চায় তারা যেন তাদের ইচ্ছা পুরণের জন্য সাহস পায়।

আমি খুব সাধারণ একটা মেয়ে। যদি ছাত্রী কেমন তা বলতে বলা হয় তবে সেটাও খুব উঁচুমানের না । ব্যাচেলর প্রায় শেষের দিকে তখনকার কথা বলছি, আমার এক খুব কাছের বন্ধু পরামর্শ দিল উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যাওয়ার জন্য। তখন থেকেই ইচ্ছা জেগে উঠল কিন্তু বেশি সাহস পেলাম না। তখন বাসার সবাই মিলে সাহস দেয়ায় প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিলাম। উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানিকেই বেছে নিলাম। জার্মানিতে বসবাসরত বাঙ্গালি অনেক বড় ভাইয়া এবং আপুরা তখন অনেক সাহায্য করেছিলেন। যাদের মধ্যে দুইজন ভাইয়ার কথা কখনোই ভোলা যাবেনা। সবকিছুই ভাল যাচ্ছিল, হটাৎ কি হল বুঝতে পারলাম না , আমার আব্বু ছাড়া বাসার বাকি সবাই আমার বিদেশ যাওয়া নিয়ে দ্বিমত পোষণ করা শুরু করল। পরে জানতে পারলাম আমার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ কেউ বাসার সবাইকে বুঝিয়েছিল যে আমাকে এখন বিয়ে দিতে, বিদেশে অবিবাহিত মেয়ে না পাঠানোই ভাল এবং টাকাও অনেক খরচ হবে বিদেশ পাঠাতে গেলে। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না কি করব। আব্বু অনেক সাহায্য করল তখন বাসার সবাইকে আবার রাজি করাতে। আব্বু খোঁজ নিল তার বন্ধুদের কাছ থেকে যে মেয়েরা জার্মানিতে কতটা নিরাপদ। আর টাকার সমস্যাটা নিয়ে আমি নিজেই খুব চিন্তায় ছিলা ম, তখন এক বড় ভাইয়া বলল “এই খরচটাকে তুমি বিনিয়োগ হিসেবে ধরে নাও যেটা একসময়

উঠে আসবে”।

অতঃপর আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে জার্মানিতে একটা মাস্টার্স প্রোগ্রামে পড়ার সুযোগ পেয়েই গেলাম। সবার সহযোগিতায় চলে আসলাম জার্মানি। এসেই আমার খালাতো ভাইয়া এবং ভাবিকে পেয়ে মনে হল আমি একা না এখানে। আর এখানের বাঙ্গালিরা এতটাই ভাল যে আমার কখনো একা লাগেনি। সবাই আমাকে অনেক ভালবাসে এবং সবথেকে বড় ব্যাপার হল, আমার জীবনের একটা অপূর্ণ শখ যে আমার কোনো আপু নেই , সেটাও এখানে এসে পূরণ হয়ে গেছে। কিন্তু চাকরী নিয়ে একটু চিন্তায় ছিলাম। তিন মাস পরে সেটাও পেয়ে গেলাম, ঠিক যা বলেছিল এখানে বসবাসরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা।

আল্লাহ্‌র রহমতে খুব ভাল আছি। বাসার সবাই এখন খুব খুশি আমাকে নিয়ে। তাই সবাইকে বলতে চাই, আপনাদের মনেও যদি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে আসার ইচ্ছা থাকে, তাহলে কোনকিছুতেই ভয় পাওয়ার দরকার নেই। নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যান আর সাহায্যের জন্য আমরা তো আছিই।

লিখেছেন,

ফাতেমা-তুজ-জোহরা নাহিদ

ইন্টারনেট টেকনোলজি এন্ড ইনফরম্যাশন সিস্টেমস,

টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অব ক্লাউসথাল,

জার্মানি

আমার আস্ফালন

মাহজাবীন চৌধুরী

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। বিশ্ব জনমতের চাপের মুখে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তির পর ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মতো এতো উচ্চমূল্য, এতো ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোনো দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয়নি।' স্বাধীনতার ৪৪ বছর পেরিয়ে গেছে। অথচ আজো কি আমরা এই 'ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন' থেকে মুক্ত হয়েছি?

বছরের বাকি ৩৬৪দিন স্বাধীনতার কথা না ভেবে শুধুমাত্র ২৬শে মার্চের দিন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গেয়ে বা শুনে ছুটি উপভোগ করা বা ফেসবুক , টুইট্যারে জাতীয় পতাকার ছবি শেয়ার করা বা গদগদ হয়ে 'স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা' মেসেজ শেয়ার করার নামই স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতা একটি অনুভূতি এবং এই অনুভূতি যদি আমরা বছরের বাকি দিনগুলিতেও উপভোগ করতে পারি তবেই আমরা প্রকৃত স্বাধীন।

দেড় বছর হলো যুক্তরাষ্ট্রে আছি পড়াশোনার জন্য। বন্ধুবান্ধব প্রায়ই বলে, 'ভালো হয়েছে এখন তুই দেশে নেই। সারাক্ষণ ভয়ে থাকি রে।' বোঝাতে পারিনা যে যত দূরেই থাকি না কেন দেশের জন্য মন ঠিকই কাঁদে। বোঝাতে পারিনা যে আতংক আমাকেও গ্রাস করে। দেশ থেকে ফোন এলেই ভয় লাগে, মনে হয়, 'সব ঠিক আছে তো? সবাই বেঁচে আছে তো?' ভালো থাকার দরকার নেই। কারণ পেট্রোল বোমার

দেশে ভালো থাকা সম্ভব নয়। বেঁচে থাকাই জরুরী ও যথেষ্ট।

কিন্তু এটুকুই কি যথেষ্ট সেই সমস্ত শহীদদের জন্য, যারা নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যে? আমরা কি চাই না আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা দুর্নীতি থেকে স্বাধীন হতে? আমরা কি চাই না একটা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ সমাজে বেঁচে থাকতে? আমরা কি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার দাবি করতে পারি না? আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি না, কেন আমাদের অর্থনীতি সামান্য কিছু লোকের সুবিধার্থে, কেন সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের কথা ভেবে নয়? আমরা কি সত্যিই স্বাধীন যখন সারা দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার এত আগ্রাসন? স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সময় একজন বাংলাদেশী হিসাবে এই প্রশ্নগুলি কি আমাদের মাথায় আসা উচিত নয়?

স্বাধীনতা নাকি 'যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।' কিন্তু কোথায়? কলম দিয়ে কাগজে আচঁড় টানলেই তো কলম ভেঙ্গে দেয়া হয়। শুধু কি তাই? আর কোনোদিন যেন কলম ধরতে না পারি তারও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হয়। উদার গণতন্ত্র? মরীচিকাও বুঝি এর চেয়ে সহজলভ্য। দেশ তো নয় যেন মৃত্যু উপত্যকা। সবকিছুই যেন নষ্টদের হাতে চলে যাচ্ছে। এই দিন দেখার জন্যেই কি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার জীবন দিয়েছিলেন রাজপথে? যাতে আমি আর কোনোদিন আমার মনের কথা বলতে না

পারি? যাতে ওরা আমার মুখের কথা কাই ড়া নিতে পারে?

এই কি আমার দেশ? এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চই কি আমার দেশ? এই বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমিই কি আমার স্বদেশ? এই রক্তস্নাত কসাইখানা দেখার জন্যেই কি আগের প্রজন্ম অস্ত্রহাতে জীবন বাজি রেখে লড়াই করে গেছেন? পূর্ব দিগন্তে সূর্য বুঝি আর উঠবে না কোনোদিন?

সারারাত আমার চোখে ঘুম আসে না। আমি বাতাসে তীব্র গন্ধ পাই লাশের। মাটিতে লেগে থাকতে দেখি রক্তের দাগ। চোখ বুজলেই কল্পনায় ভেসে উঠে কিছু শকুন , যারা খামচে ধরেছে আমার লাল-সবুজ পতাকা। তবে কেন আমি দিন বদলের জন্য অপেক্ষা করি? তবু কেন বুকের ভেতর ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে ক্রোধের? তবু কেন ফেব্রুয়ারী মাস এলেই বুকটা গর্বে ভরে যায় ভাষা শহীদদের জন্যে ? তবু মার্চ মাস এলেই কেন আমার আত্মা গেয়ে ওঠে, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' তবু কেন আমি জ্ব লে, পুড়ে মরে ছারখার হয়ে যেতে রাজি আছি, কিন্তু মাথা নোয়াতে নই? আজও না, কক্ষনো না।

লিখেছেন,

মাহজাবীন চৌধুরী

মাস্টার্স ইন আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশন

লুইসিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি ,

যুক্তরাষ্ট্র

স্বাধীনতার স্বপ্ন

আজমেরী হাসনাত মুন্নী

প্রতি বছরেই তো একটি করে

স্বাধীনতা আসে।

আবার নতুন স্বপ্নে বুক বাঁধার

প্রেরণা নিয়ে।

আজতো সেই স্বাধীনতা দিবস,

তাইনা.....

যার জন্য ২৫শে মার্চে

এত মৃত্যু-

এত রক্তের বন্যা গিয়েছে বয়ে।

শুধু একটা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে,

পরাধীনতাকে দু'হাতে দুমড়ে মুচ
দিতে।

সেই সাধারণ মানুষের লাশগুলো

তোমরা শুনছো তো,

তোমাদের জন্য আজও স্বাধীন বা
কাঁদে।

কাঁদে নীরব চোখে-

যে চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন আঁকে মানুষ

স্বাধীন দেশের শত পরাধীনতার মাঝে।

তোমরা শুনছো তো!

এখানকার রাজনীতিও লাশ নেয়

নিরীহ কিছু ছাত্রের,

কিছু নিরাপরাধ মানুষের।

অস্ত্রের অট্টহাসি আজ

স্বাধীনতার বাণীকে উপহাস করে।

তারপরও আমরা স্বাধীন জাতি।

স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি।

মৃত্যু নয়, আর মৃত্যু চাইনা।

জীবনের স্বপ্নে-

আজও দিনের প্রহর গুলো কাটে।

স্বাধীনতার একান্ত সুখের জন্য

এখনও সবাই কাঁদে।

কাঁদে আমার কবিতার খাতা

শুধু স্বাধীনতার জন্য।

নতুন স্বপ্নে দু'চোখে স্বপ্ন দেখতে।

লিখেছেন,

আজমেরি হাসনাত (মুন্নী)

হ্যানোভার, জার্মানী

স্বাধীনতা ভার্সাস নারী

আফরোজা আইরিন

কিছুদিন আগে উপর মহলের ভাই -ব্রাদার মারফত জানতে পারলাম, "জার্মান প্রবাসে" ম্যাগাজিনে স্বাধীনতা সংখ্যায় লেখার ডাক পড়েছে। কি লিখবো, কি লিখবো ভাবছিলাম। এক সময় বাধ্য হলাম স্বীকার করতে, নাহ, স্বাধীনতা সম্পর্কে জ্ঞানের পরিমাণ খুবই সীমিত। সীমিত জ্ঞান নিয়ে কিছু লেখাটা দুঃসাহসের পর্যায়ে পড়ে। পাহাড়সম (!) মনোকষ্ট নিয়ে অতঃপর চিরবন্ধু ফেইসবুকের কাছে গেলাম।

ঘুরতে ঘুরতে "ডয়েচে ভেলের " একটা পোস্টে চোখ আটকে গেল "বাঙালি নারীর দশ গুন", যার মূল বক্তব্য- বাঙালি নারী আবেগী, স্বাধীনচেতা, উৎসবপ্রেমী, নারীবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাবতেই কি ভালো লাগে, আহা আমাদের কত গুণ! কথা কিন্তু সত্য, এত গুণের সম্মেলন শুধু বাঙালি নারীদের বেলাতেই সম্ভব। আরেকটা সত্য হলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই গুণের কদর হয় না। সেটাকে বিষয়বস্তু ধরে আমাদের দেশে বেশ কয়েকজন নারীবাদীর উদ্ভব। একেক সময় একেক আলোচনায় ব্যস্ত তারা। কিন্তু আমার স্বল্প জ্ঞানে আমি এখনো বুঝতে পারিনা, এক্সাক্টলি কি স্বাধীনতার কথা বলে তারা!

ছোটবেলায় একটা জিনিস খুব কষ্ট লাগত আমার । যখন মা খালাদের দেখতাম তাদের সারাদিনের খাটুনি শুধুমাত্র এ কটা ঘরের মাঝেই সীমাবদ্ধ। মুখে যদিও কখনো স্বীকার করতাম না , তবুও চেষ্টা করতাম যতটা সম্ভব সাহায্য করার। এবং সেটা অবশ্যই আমি মেয়ে বলে না, অপরাধবোধ থেকে- একটা মানুষ কি করে পারে প্রতিদিন অবিরাম এভাবে পরিশ্রম করতে!

আরেকটু বড় হলাম, হাইস্কুলে পড়ি তখন। মুই কি হনুরে একটা ভাব! সবকিছুতেই তখন শুধু "জালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও" চিন্তা।

ভাবতাম কেন মেয়েদেরই শুধু ঘরে থাকতে হবে , ছেলেদের কেন কোনো দায়িত্ব নেই। হবে না, মানি না! ছেলেদের ঘরের সব কাজ করতে হবে মেয়েদের মত, বাইরেও সমান ভাবে সব কাজের অধিকার দিতে হবে। আমাদের বাসায় এসব দাবীর প্রয়োগও শুরু করে দিয়েছিলাম। বাসায় আমার কাজ আমি করব আর আমার একমাত্র ভাইধন তার নিজের সকল কাজ নিজে করবে (নিজের রুম ঝাড়ু দেয়া সহ)। বেচারা যদিও এক সপ্তাহ পর ক্ষেমা দিয়েছিল, কিন্তু এরপর অন্তত তার অগোছালো ভাবখানা আর ছিল না!

গার্লস স্কুলে পড়লেও কোচিং ক্লাস ছিল ছেলে-মেয়ে সম্মিলিত। সেখানেও একই "ঝাঁসী রানী" ভাব আমার (পরবর্তীতে অবশ্য বুঝতে পারি কেমন পাগল ছিলাম তখন :P)। সব মেয়ে আমার থেকে বেশি নম্বর পাক, নো প্রবলেম, কিন্তু একটা ছেলের ক্ষেত্রেও এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারবে না! কোনো ছেলের সাথে কথা বলা যাবে না, ওদের কথার উত্তর দেয়া যাবে না। যদিও আজ পর্যন্ত আমার কাছে কোনো লজিক নেই কোত্থেকে এসেছিল আমার মাথায় ওই অদ্ভুত আইডিয়া। বলাবাহুল্য, হাইস্কুলের পুরো সময়টাতেই আমার ঝাঁসী কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল।

মাঝখানে আরো কিছু সময় আরো কিছু অভিজ্ঞতা আরো নতুন কিছু জানা। তারই সাথে আমার চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন অনেক নতুন উপলব্ধি। ভার্সিটিতে পড়াকালীন সময়ে একবার অন্য ডিপার্টমেন্টের একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। বেশ আধুনিকমনা। ভালো লাগত কথা বলে ওর সাথে। অনেক বিষয় নিয়েই কথা হতো আমাদের- অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনীতি, সামাজিকতা ইত্যাদি। শুধু একটা জিনিসে আমাদের প্রায়ই তর্ক হতো যা কখনো কোনো সমাধানে পৌঁছেনি। তা'হলো এই "নারীবাদী" ব্যাপারটা। ওর মতে মেয়েদেরকে কখনোই ছেলেরা নিজের লেভেলে উঠতে দেবেনা, সুতরাং যা করার মেয়েদেরই করতে হবে। ইউরোপের মেয়েদের মত স্বাধীনচেতা হতে হবে। ছেলেদের কোনো কেয়ার করার দরকার নাই। আমাদের বুদ্ধি বিবেক আছে সেটা কাজে লাগাতে হবে, দ্যাটস ইট!

প্রথম প্রথম ওর কথা শুনে আমার মনে হত এত রেসিস্ট কেন মেয়েটা! একদিন ওকে আমার ভাবনাগুলো বললাম, আমার মতবাদ ভিন্ন। যদিও ঠিক ওর ভাবনাগুলো আমারও ছিল একসময় কিন্তু এখন কোনমতেই ছেলেদের কম্পিটিটর ভাবা আমি পছন্দ করিনা। এটা অবশ্যই মানতে হবে যে সমানুপাতিক অবস্থাটা আনা সম্ভব না। অন্তত আমাদের দেশের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় বর্তমান

সময়ে। ইউরোপের নীতিধারা তো আর বাংলাদেশে কায়েম হবে না। সুতরাং কম্পিটিটর ভাবলে শুধু পেছনের দিকেই যাওয়া হবে, ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় যদি সহযোগী মনে করা হয়। সবার সামর্থ্য এক নাও হতে পারে, সেটা শুধু মেয়ে না, ছেলেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেটা মেনে নেয়াতে কোনো অপরাধবোধ থাকা উচিত না আমার মতে। বরং সেটা স্বীকার করে দ্বিগুন এফোর্টে কাজ করাটা প্রশংসনীয়।

দেশের বাইরে আসার পরও আমার সেই চিন্তা ধারার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আরো জোরালো হয়েছে। এখন যদি দেশের কেউ বলে ইউরোপের মেয়েরা অবাধে চলতে পারে, আমরা না কেন? কারণ হলো সমাজ ব্যবস্থা। এই যেমন, আমার জার্মান মেয়ে কলিগ প্রতিদিন লাঞ্চের পর সিগেরেট খায়, তাতে আমার বিন্দুমাত্র ভাবলেশ নেই। কিন্তু এই আমিই দেশের বসুন্ধরা শপিং মলের মেয়েদের সিগে রেট খেতে দেখলে, ভূত দেখার মত চমকে উঠতাম! তাই বলে এটা দাবি করা সম্ভব না যে আমাদের দেশেও সকল পাবলিক প্লেসে মেয়েদের এইধরণের অধিকার দেয়া হোক। আমাদের প্রেক্ষাপট অবশ্যই ভিন্ন।

একটা কথা শুনেছিলাম অনেক দিন আগে, যেমন দেশ তেমন বেশ। যুক্তিযুক্ত কথা, বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় ইউরোপের মেয়েদের স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব না। আর কেনই বা আমাদের স্বাধীনতার মাপকাঠি ইউরোপ হবে! আমি যতটুকু বুঝি, তাতে যেই সামাজিকতায় আমরা থাকি, সেখানে থেকেই মেয়েদের নিরাপত্তা, সম্মান নিশ্চিত করা, সাবলম্বী হওয়া- এই প্রাপ্তির নামও "স্বাধীনতা"। আর সেটা এমন এক স্বাধীনতা যা অর্জন করতে আন্দোলন না, দরকার উপযুক্ত শিক্ষা, দরকার প্রতিটা মানুষের সচেতনতা, দরকার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি।

লিখেছেন,

আফরোজা আইরিন

মাস্টার্স স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটি অফ বন

রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফ্রনহফার ইনস্টিটিউট ফর অ্যালগরিদমস এন্ড সায়েন্টেফিক কম্পিউটিং

বন, জার্মানি

নড়বড়ে শিক্ষা ব্যবস্থা

সারা তাবাসসুম

৪৩ বছর আগে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যতটুকু জানি তার সবটাই জানি বইয়ের পাতা, তথ্যচিত্র এবং বড়দের কাছ থেকে শুনে। যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া দেখতে দেখতেই কবে যেন আমরা বড় হয়ে গেলাম। একটা ব্যাপারে অনেকেই হয়তো একমত হবেন, এতগুলো বছরে, দিন যত যাচ্ছে দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক অস্থিরতা তত বাড়তে আমরা দেখছি। দেশের কোন ব্যাপারটা দেখে আমি শেষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি আমার মনে নেই।

বিগত ৪-৫ বছর ধরেই পরিকল্পনা করছিলাম উচ্চশিক্ষার জন্য আমি দেশের বাইরে যাব। আমার এই চিন্তার কথা শুনে আমার বড় ভাই একটা কথা আমাকে অনেকবার বলেছেন, পৃথিবীর এই ভূখন্ডে (বাংলাদেশে) স্রষ্ঠা তোমাকে পাঠিয়েছেন, তাই এই জমিনের প্রতি, এর মানুষের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য তুমি এড়াতে পারোনা, যেমন পারোনা তোমার পরিবারের প্রতি যদি ভালো মানুষ হও।"

আমাদের তরুণ সমাজই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এই বিশ্বাস আমি করি। শৈশব থেকে তারুণ্য এই লম্বা সময় (প্রায় ১৬ বছর), শিক্ষা অর্জনে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজেদের জীবনের মহামূল্যবান সময় আমাদের ছেলেমেয়েরা ব্যয় করে সেগুলো ৩টি মাধ্যমে বিভক্ত। বাংলা, আরবী এবং ইংরেজী মাধ্যম। এই তিন মাধ্যমের মান একটা থেকে আরেকটার অনেক পার্থক্য। ইংরেজী মাধ্যমগুলোর লাগামহীন নীতিমালা বহির্ভূতভাবে বেতন বাড়ানো, দেশীয় সংস্কৃতির চরম অবহেলা; আরবী মাধ্যমগুলোর ধর্মসম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান না করা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্যের বিষয়গুলোকে মারাত্মক অবহেলা এবং বাংলামাধ্যমগুলোর অত্যন্ত দুর্বল মানের পাঠ্যবই, ব্যবহারিক জ্ঞানবিমুখতা, ইত্যাদি অসংগতি নিয়েই প্রায় ১৬ বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করেন এই দেশের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী।

চলমান এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কতদূর আমরা যেতে পারব জানিনা। এটা আমাদের উন্নতির পথে অন্যতম অন্তরায়। আমাদের দেশ পরিচালনা যারা করছেন, এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তাদেরই। কিন্তু

উনারা কি নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তা না হয় নাই আলোচনা করি। শুধু এইটুকু আশাকরি এখনো যারা বাইরে কিছু খেয়ে খোসাটা পকেটে নিয়ে ঘোরেন এবং যথাস্থানে গিয়ে সেটা ফেলেন, যেসব বাবা-মা কষ্ট করে কোনরকমে খেয়ে পরেও সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়ান, অভাবের সংসার হলেও এখনো যারা সৎ জীবন যাপন করেন, তাদের জন্য এই দেশটা যেন বাঁচে।

আজকে স্বাধীনতার গল্পতো আমাদের শিশু-কিশোরদের আমরা অবশ্যই বলি, কিন্তু মনের ভিতরে এটাও আমরা জানি যে স্বাধীনতা এখনো আমরা ওদের দিতে পারি নাই। আজকে প্রচন্ড শক্তিশালী দুর্নীতির কুচক্র, অসংগতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, পঙ্গু আইনব্যবস্থা, ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয়, স্বজাতি-বিশ্বাস নিয়ে হীনমন্যতা, অপসংস্কৃতি চর্চা, খাদ্যে বিষ প্রয়োগকারীচক্র এবং কারাগার তুল্য শহুরে আবাসন ব্যবস্থায় আমরা বন্দী। লেখা পড়ে অনেকেই বলতে পারেন আমার অবস্থা - "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস"।

আমরা জানি প্রতিটা দেশেই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু, বাংলাদেশের মত প্রায় প্রতিটা খাতে বড় বড় সমস্যাগুলোর এক এক করে সমাধান না হয়ে দিন দিন আরো জটিলতর হওয়াটা মোটেই স্বাভাবিক কোনো লক্ষণ হতে পারে না। তবে আমি হতাশাবাদী কেউনা। বাংলাদেশ এবং পুরো পৃথিবীকে নিয়ে যারা স্বপ্ন দেখেন, আশাবাদী, আমি তাদেরই একজন। হতাশা কোনো কাজের কথা নয়।

আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (সা:) যখন উনার জন্মভূমি ছেড়ে যাচ্ছিলেন, অশ্রুসিক্ত চোখে বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন উনার জন্মভূমির দিকে। উনার মত আমিও কি কোন দিন আমার জন্মভূমি ছেড়ে যাব? জানিনা। যখন ফিরবো কি নিয়ে ফিরতে পারবো তাও জানিনা।

মাতৃকোলস্বরূপ প্রিয় বাংলাদেশ তোমার জন্য আমার ভালোবাসা, আমার প্রার্থনা।

লিখেছেন,

সারা তাবাসসুম

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ,

ঢাকা

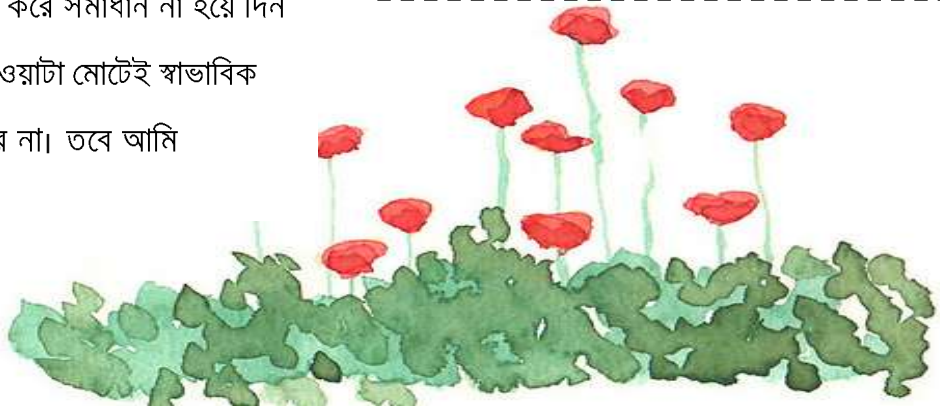

রোলিংস্টোন (পর্ব ৮): নারীর গল্প

তানজিয়া ইসলাম

আমার এই লেখাটি ‘চ’ তে এসে থেমে ছিল নানান কারণে...অনেক সময় হতাশা থেকে অনেক সময় ব্যস্ততা থেকে। তারপরও অনেক দিন পরে কলম ধরতে হলো কলমের জোর বেশি নাকি তলোয়ারের তা পরীক্ষা করার জন্যে। লেখকের কলম হোক সব থেকে ধারালো; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হোক তার মর্যাদা। আজকের লেখাটিতে জীবন থেকে নিয়ে অল্প কিছু মানুষের কিছু টুকরো ঘটনার কথা বলবো আমি যা সরাসরি জীবন থেকে নেয়া এবং সাধারণ ঘটনা। তবে ঘটনাগুলো নিয়ে কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য-আপনার আশপাশে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটে আপনি কি মূর্তির মতন নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন কিনা? পাঠককে আয়নার সামনে দাঁড় করানোর এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এর দায়ভার কিন্তু শুধুই আপনার, অন্যকে দোষ দেবেন না। আমার প্রশ্ন- আপনি নিজে কি করেন?

‘ছ’ এর কারণেই আজকে আবার লিখতে বসা তাই তাকে দিয়েই শুরু। একটা ছোট্ট মেয়ে আছে তার, বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর চারটি বছর একা সামলেছেন মেয়েটাকে। পরিবারের সবার কথায় মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে 'ছ' পাড়ি জমিয়েছেন বিদেশে ৩০ বছরের মতন বয়েসের ব্যবধান থাকা নতুন স্বামীর সাথে, হয়তো মেয়েটির একজন অভিভাবক পাওয়া যাবে এই ভেবে। বছর পার হয়ে যাচ্ছে ঠিকই না পারছেন মেয়েটাকে নিজের কাছে আনতে না পাচ্ছেন ব্যক্তি স্বাধীনতা। পরিবারের সাথে দেশে কথা বলতে হলেও পতিদেব (বাবা) হন নাখোশ। আমার সাথে ঘন্টা খানেকের পরিচয়, প্রশ্ন করেছিলাম যাবেন দেশে, আমি কি আপনাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো? আমাকে মলিন মুখে বলেছেন না । আমার প্রশ্ন দেশের সমাজ আর পরিবার এমন কেন যে একজন নারী নিজের দেশে যেতে চান না? ভাই সবাইতো তসলিমা নাসরীনের মতন ঠোঁটকাটা না অথবা ভাষার ব্যবরও অমার্জিত না; তারপরও দেশের সমাজ একজন নারীর জন্যে প্রতিকূল কেন? আপনি বা আপনারা কিসের

ভিত্তিতে একজন নারীর জীবনের নকশা করেন বলবেন কি?

‘জ’ এর কথা বলতে গিয়ে একটা কথাই মনে আসে দোষটা আসলে কার! বাঙালি সমাজে জন্মানো নারীর নাকি আপনার মন মানসিকতার? বাবা-মায়ের কথা শুনে এক সপ্তাহের নোটিশে বিয়ে করে সুপার ট্যালেন্ট স্বামীর সাথে পাড়ি জমালেন বিদেশ। ছাড়তে হলো চাকরি, মাস্টার্স এর পড়াশোনা, জীবন সবকিছু...। এসে বুঝলেন তার পতিদেবের না আছে ঘরের প্রতি মায়া, না আছে স্ত্রীকে ভালোবাসার সময়। তিনিতো আগের প্রেমিকাকে ভোলার আর কিছু উপরি পাওয়া, ফ্রি কাজের বুয়া আর তার হঠাৎ হঠাৎ (এই ধরেন ২-৩ মাসে একবার) চাহিদা মেটানোর জন্যে দরকার ছিল একজন দাসীর। যখন ‘জ’ নানান বিষয়ে কথা বলে উঠতেন কিংবা চাইতেন তার প্রাপ্য মর্যাদা তখন কিন্তু পতিদেব বন্ধু মহলে দুঃখ করে বলতে দ্বিধা করেননি যে এই বিয়ের থেকে তো পতিতালয়ে যাওয়া অনেক ভালো ছিলো! আমার প্রশ্ন ওই ডিগ্রিধারী পতিদেব অমানুষকে আর তার বন্ধুদের যারা দেশের হাতে গোনা উচ্চশিক্ষিতদের মাঝে পড়েন...তা আপনি এবং আপনারা কি করেছিলেন? এখনোতো আপনাদের বন্ধুত্বের কোন খাদ নেই, প্রশ্ন করুন নিজেকে আপনি-আপনারা আয়নার সামনে কিভাবে দাঁড়ান? স্ত্রীকে এসে যখন বলেন আমি পতিতালয় থেকে এসেছি, আপনার লজ্জা করে না?

‘ঝ’এর ওপর নাম নারী স্বাধীনতা এবং একটি অনিচ্ছা। অদ্ভুত এই প্রতিবাদের ধরণ কিন্তু উপায় নেই বলেই তিনি করেছেন এমন জীবন যাপন। ঝ বিয়ে করেননি কারণ তার পরিবারের এবং আশেপাশের নারীদের জীবন সংগ্রাম দেখে হয়ে গেছেন নির্লিপ্ত এবং ক্লান্ত। আমি কোনো এক সময় প্রশ্ন করেছিলাম কেন? উত্তর ছিল-ভালো লাগে না বিশ্বাস করতে। আজকে তিনি সফলভাবে দেশের জন্যে কাজ করে যাচ্ছেন, নানান গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষের জন্য কাজ করছেন। মাঝে মাঝে শখের বসে রান্না করেন, বন্ধুদের সাথে আড্ডায় সামিল হন আর এই নিয়ে পরিবার নারাজ! তা আমার প্রশ্ন সেইসব পরিবারের মানুষ-জনদের কাছে একজন নারীর জন্যে কি বিয়েই সব, তার কাজের মাধ্যমে কি তাকে চেনা সম্ভব নয়? কেন একজন নারীকে পরিবার সামলাতে হবে...বাংলাদেশে কি মানুষের কমতি ? তার মূল্যবান সময় দিয়ে কাজকে নিয়েছেন নিজের জীবন হিসেবে, তাতে দোষটা কি?

‘ঞ’ গল্পের যেন কোনো শেষ নেই। এই আধুনিক যুগে এসেও বাঙালি সমাজে বিশেষ করে ঘরের বউদের (ঘরের ছেলেদের বেলায় নয়) জোর করে ধর্ম পালনে বা হিজাব পরতে বাধ্য করে।এমন কোনো কথা বলা যাবেনা যা মানুষের কাছে তোমার এবং তোমার পরিবারকে ছোট করে। এই এবং সেই নানান কথা তবে কিছু অপ্রাসঙ্গিক সত্যও আছে যাকে আমি বলি ব্রেনওয়াশ। ‘ঞ’ বিয়ে করেছিলেন একজন সাধারন ভালো মনের মানুষকে যার মতন বন্ধু জীবনে পাওয়াও অনেক বড় ব্যাপার। প্রবাসের পিএইচডির সুযোগ ছেড়ে দেশে চলে এসেছেন তার স্বামী শুধুমাত্র তার বিদেশে থাকতে ভালো লাগেনা না বলে! আফসোস, ধর্মান্ধতার কারণে হলো না সুখের সংসার। ধর্ম পালনে জোর চলেনা, কিন্তু তার প্রতি জোরই করা হল। তার পরিবারের ধর্ম পালনের ধরণ আলাদা, বাঙালি মূল্যবোধের আছে অনেক কমতি। পরিবারের সাথে সময় কাটানো থেকে হিজাবী কালচার বেশি পছন্দ, ধর্মীয় গোঁড়ামি করতে গিয়ে ছিল না কোনো স্বাভাবিক জীবন ধারণের ইচ্ছাপূরণ। পাঠিয়ে দিয়েছেন তালাক নামা, সাথে নিয়ে গেছেন গয়না-গাটি। আজকে আমার ক্ষমতা থাকলে আমি উক্ত সার্কাস পরিবারটিকে টিকেট কেটে সিরিয়াতে পাঠিয়ে দেব ISIS এ যোগ দেয়ার জন্যে। বাঙালি সমাজে এত এবনরমাল দুই চারজন থাকলে দেশের তেরটা বাজতে বেশি সময় লাগবে না। আপনার কি মনে হয়? আপনি কি আপনার পরিবারে ধর্মান্ধতা আর হিজাব ফ্যাশন শেখান নাকি মূল্যবোধগুলা সেখান, বাঙালি সংস্কৃতি শেখান?

পুনশ্চঃ সাধারণত পাবলিকপোস্ট লেখার সময় অনেক চিন্তা করে পরিমার্জিত ভাষায় লেখার চেষ্টা করি, বিশেষ করে কারো ব্যক্তিগত অনুভূতিতে আঘাত না লাগে। তারপরেও অনেক সময় বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে কল্পনার জগত মেলানো সম্ভব হয়ে ওঠেনা। এই লেখার ভাষা অনেক সময় আক্রমণাত্মক মনে হলেও কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্য এবং চেষ্টা করা হয়েছে যাতে সবার পাঠযোগ্য হয়।

লিখেছেন,

তানজিয়া ইসলাম

ডক্টরাল রিসার্চার, টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ বার্লিন

বার্লিন, জার্মানি

নোটিশ বোর্ড

"ছবি মেলা"

সৃষ্টির আনন্দে তৃপ্তি আসে নি , এমন কখনো কারো ক্ষেত্রে হয়েছে কিনা বলা কঠিন। আরো বেশী কঠিন, সেই আনন্দ কাছের বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করে স্বস্তি আর সার্থকতা পায় নি, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া। "ছবি তোলা" এই সৃষ্টিশীল প্রতিভার একটা বড় স্বাক্ষর খোদাই করে।

হতে পারে শীতের ভোরে ঘুম থেকে উঠে জানালার ধার ঘে সে কুয়াশাসিক্ত নুইয়ে থাকা শিশির ভেজা পাতাগুলোর আ র্দ্র সৌন্দর্য হতে পারে আপনার সৃষ্টি , হতে পারে গ্রীষ্মের দাহ্য গরমে বিস্তৃত নদীতে দূর দিগন্তের খো লা আকাশের ডুব দেয়ার মুহূর্ত হতে পারে আপনার সৃষ্টি , হতে পারে শেষ বিকেলে ব্যস্ত পৃথিবীর ঘরে ফেরার তৃপ্তি আপনার সৃষ্টি , হতে পারে একটা পটভূমিতে ল্যাম্প-পোষ্ট কে কোণায় বন্দি করে বাকি পৃথিবীর অন্ধকারকে নতুন করে সৃষ্টি , হতে পারে আমার স্মরণীয় মুহূর্তের সেই ছবি যেটা কে প্রতি বার নতুন করে আপনারই সৃষ্টি। এরকম আরো অনেক রকম সৃষ্টিশীল বিষয় নিয়েই জার্মান প্রবাসে শুরু করতে যাচ্ছে **"ছবি মেলা"**। আর, ছবিগুলো হবে আপনাদেরই।

ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা, বা, তোলা হয়ত স্মার্ট ফোনে, আজই শেয়ার করুন আমাদের সাথে। ছবি জমা দিতে শুধুমাত্র আমাদের ফেইসবুক পেইজে পোষ্ট করলেই হবে। এখান থেকে নির্বাচিত ছবি গুলো যাবে পরের সংখ্যার ম্যাগাজিনে।

আপনাদের সুবিধার্থে ছবি জমা দেয়ার কিছু নিয়মাবলী দেয়া হল। চোখ বুলাতে ভুলবেন না।

১) ছবির রেজুলেশন নুন্যতম ২ মেগাপিক্সেল হতে হবে
২) ছবির সাথে অবশ্যই ছবির প্রেক্ষাপট বা বর্ণনা (যেটা ফটোগ্রাফার-এর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ) থাকতে হবে। (বাংলা বা ইংরেজিতে)
৩) ছবি তোলার জায়গা এবং তারিখ
৪) ফটোগ্রাফার-এর নাম এবং ঠিকানা
চোখ রাখুন পরবর্তী আপডেট পেতে আমাদের **ফেসবুক পেইজ " জার্মান প্রবাসে"**

আর যেকোনো কিছু জানতে german.probashe@gmail.com -এ ইমেইল করতে পারেন

টিম জার্মান প্রবাসে

চিফ এডিটরঃ দেবযানী ঘোষ, আখেন

এডিটরঃ জাহিদ কবীর হিমন, হ্যানোভার

চিফ মার্কেটিং অফিসারঃ আনিসুল হক খান, ওফেনবুর্গ

চিফ অর্গানাইজিং অফিসারঃ হোসাইন মোহাম্মাদ

তালিবুল ইসলাম, ফ্রাঙ্কফুর্ট

অফিসিয়াল ফটোগ্রাফারঃ দেবরাজ কর, ইলমেনাউ

কোওর্ডিনেটরঃ রশিদুল হাসান, আখেন

কোওর্ডিনেটরঃ শরিফুল ইসলাম,মাগদেবুর্গ

মিউনিখ প্রতিনিধিঃ জামাল উদ্দিন আদনান, মিউনিখ